# শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

(নভেম্বর '১৫ সংখ্যার পর)

ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভূগর্ভো মাধবো মধুসূদনঃ ॥২১

**শাংকরভাষ্য :** সর্বভূতনিয়ন্তৃত্বাৎ *ঈশানঃ*। প্রাণান্ দদাতি চেষ্টয়তীতি বা *প্রাণদঃ* 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ' (তৈত্তিরীয় ২।৭) ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা, প্রাণান্ কালাত্মনা দ্যতি খণ্ডয়তীতি *প্রাণদঃ*, প্রাণান্ দীপয়তি শোধয়তীতি বা, প্রাণান্ দদাতি লুনাতীতি বা *প্রাণদঃ*।

প্রাণিতীতি *প্রাণঃ* ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মা বা, 'প্রাণস্য প্রাণম্' (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৮) ইতি শ্রুতেঃ। মুখ্যপ্রাণো বা। বৃদ্ধতমো *জ্যেষ্ঠঃ* 'জ্য চ' (পাণিনিসূত্র ৫।৩।৬১) ইত্যধিকারে 'বৃদ্ধস্য চ' (পাণিনিসূত্র ৫।৩।৬২) ইতিবৃদ্ধশব্দস্য জ্যাদেশবিধানাৎ।

প্রশস্যতমঃ *শ্রেষ্ঠঃ* 'প্রশস্যস্য শ্রঃ' (পাণিনিসূত্র ৫।৩।৬০) ইতি আদেশবিধানাৎ। 'প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ' (ছান্দোগ্য ৫।১।১) ইতি শ্রুতেঃ। মুখ্যপ্রাণো বা, 'শ্রেষ্ঠশ্চ' (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।৮) ইত্যধিকরণসিদ্ধত্বাৎ। সর্বকারণত্বাদ্ বা জ্যেষ্ঠঃ, সর্বাতিশয়ত্বাদ্ বা শ্রেষ্ঠঃ।

ঈশ্বরত্বেন সর্বাসাং প্রজানাং পতিঃ *প্রজাপতিঃ*।

হিরণ্ময়াণ্ডান্তর্বর্তিত্বাৎ *হিরণ্যগর্ভো* ব্রহ্মা বিরিঞ্চিঃ তদাত্মা, 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে' (ঋগ্বেদসংহিতা ১০।১২১।১) ইতি শ্রুতেঃ।

ভূগর্ভে যস্য স *ভূগর্ভঃ*।

মায়াঃ শ্রিয়ঃ ধবঃ পতিঃ *মাধবঃ* মধুবিদ্যাবোধ্যত্বাদ্বা মাধবঃ। 'মৌনাদ্ধ্যানাচ্চ যোগাচ্চ বিদ্ধি ভারত মাধবম্।' (মহাভারতে উদ্যোগপর্বণি ৭০।৪) ইতি ব্যাসবচনাদ্ বা মাধবঃ। মধুনামানমসুরং সূদিতবান্ ইতি *মধুসূদনঃ*।

কর্ণমিশ্রোদ্ভবং চাপি মধুনামমহাসুরম্।
ব্রহ্মণোঽপচিতিং কুর্বন্ জঘান পুরুষোত্তমঃ ॥
তস্য তাত বধাদেব দেবদানবমানবাঃ।
মধুসূদন ইত্যাহু ঋষয়শ্চ জনার্দনম্ ॥'
(মহাভারতে ভীষ্মপর্বণি ৬৭। ১৪—১৬)
ইতি মহাভারতে ॥ ২১ ॥

**ভাষ্যানুবাদ :** পূর্বের দুটি শ্লোকে শ্রীমন্নারায়ণের নামোচ্চারণের মধ্যে আচার্য শংকর দেখেছিলেন দুটি পৃথক তত্ত্বের বা ভাবের আভাস। 'অপ্রমেয় হৃষীকেশং'—শ্লোকটি নির্গুণ নিরাকার তত্ত্বের এবং 'অগ্রাহ্য শাশ্বত কৃষ্ণ'—শ্লোকটির ভাষ্য মূলত সগুণ সাকার ভাবের আলোয় রচিত। এখানে এই শ্লোকে পিতামহ ভীষ্ম নারায়ণকে সম্বোধন করছেন 'ঈশান' উচ্চারণে। ভাষ্যকার এই শ্লোকের ভাষ্য করেছেন ঈশ্বরের সগুণ নিরাকারভাব নিয়ে, সর্বব্যাপী অদৃশ্য সর্বভূতের নিয়ন্তারূপে। আমরা পূজায় মন্ত্রে উচ্চারণ করি, 'সর্বভূতাধিপতয়ে ঈশানায় নমঃ' অর্থাৎ সর্বভূতের বা সমস্ত প্রাণীর যিনি অধিপতি,

যিনি নিয়ন্তা, যাঁর সংকল্পমাত্রে এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হচ্ছে, সেই সর্বব্যাপী সগুণ সত্তাই ঈশান। বাস্তুশাস্ত্রে বলা হয় উত্তরপূর্ব দিশা থেকে একটি শক্তিপ্রবাহ বা দিব্যতরঙ্গ পৃথিবীতে বা ভূমিতে নিরন্তর বহে চলেছে, তাই জমির উত্তরপূর্ব বা ঈশান কোণ পবিত্রতম ক্ষেত্র। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যেন বোঝাতে চাইছেন, পরিদৃশ্যমান এই জগতের অন্তরালে একটি অদৃশ্য শক্তি নিরন্তর ক্রিয়া করে চলেছে, সেই সত্তাকে, সেই শক্তিকে উপলব্ধি করো, স্বীকার করো। একমাত্র তাঁকে জানলেই জীবনের সমস্ত কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে এমনই কিছু কথা অর্জুনকে বলেছিলেন ভগবান স্বয়ং : ''হে অর্জুন, তুমি আমার প্রিয় বলে তোমার হিতকামনায় তোমাকে বলছি—আমিই এই সৃষ্টির আদিপুরুষ, যারা আমার ওই ঐশীসত্তাকে জানতে পারে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।'' (১০।১,২,৩)

তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলছেন, ব্যক্ত বা স্পষ্ট কিছুই ছিল না আদিতে। অব্যক্ত ছিল এই জগৎ, একমাত্র ব্রহ্মই তখন সত্তা। সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টি হল নামরূপময় এই জগৎ : ''অসৎ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদ্ অজায়ত'' (২।৭)। তাই ঋষিরা সেই আদিপুরুষকে বলেছেন, সু-কৃৎ (সুন্দর স্রষ্টা) বা স্ব-কৃৎ (স্বয়ং স্রষ্টা)। ওই সুকৃৎ-ই ঈশান।

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে পিতামহ ডেকেছেন 'প্রাণদঃ' বলে। একেবারে আক্ষরিকভাবে পিতামহ যেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের মন্ত্রমালা পাঠ করে চলেছেন : ''যৎ বৈ তৎ সুকৃতম্ রসো বৈ সঃ'' (২।৭)। সেই সুকৃৎ (সগুণ ব্রহ্ম)-ই সৃষ্টির সমস্ত বস্তুতে 'রস'-রূপে অনুস্যূত বা সঞ্চারিত। প্রাণই সেই রস, আনন্দই সেই রস, মাধুর্যই সেই রস। সেই রসাস্বাদনই জীবের কর্মপ্রেরণা—প্রাণ সেই উর্জা, প্রাণই জীবের কর্মের দ্যোতনা। তাই তিনি (সুকৃৎ বা ঈশান) প্রাণদ, প্রাণপুরুষ, প্রাণস্বরূপ, প্রাণ।

সৃষ্টির অভিনবত্ব এই প্রাণের স্পন্দনে। প্রাণই জীবনের লক্ষণ। প্রাণহীনতাই জড়ত্ব। ভাষ্যকার এই অবসরে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের আনুষঙ্গিক মন্ত্রগুলিকে : ''কঃ হি এব অন্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ'' (২।৭)। অর্থাৎ যদি ঈশ্বর না চাইতেন, তবে কেই বা সঞ্চালন করতেন আমাদের শরীরের প্রাণক্রিয়া বা অপানক্রিয়াকে? আমাদের প্রাণের প্রেরণার মধ্যে স্বয়ং 'কাল' বা 'ভবিতব্য' ক্রিয়া করে। এই প্রাণের মাধ্যমেই ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীকে সৎকর্মে বা অসৎকর্মে প্রেরণা দিচ্ছেন, প্রাণীর সৃষ্টি বা বিনাশ করছেন : ''বলাৎ আকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।''

তন্ত্রে আছে অখণ্ড অনাহত ওংকার যখন বায়ু বা প্রাণের সংস্পর্শে বা সংঘাতে আসে তখনই খণ্ডিত হয়ে জীবদেহের ষট্চক্রে স্থিত বর্ণসংকল্পে পরিণত হয় বা বৃত্তির উদ্ভব ঘটায়। বৃত্তি-ই (মনের বাসনা, বিক্ষেপ) দেহবোধ সৃষ্টি করে, সৃষ্টিতে ভেদ আনে। অর্থাৎ প্রাণই বন্ধন, প্রাণের ঊর্ধ্বগতি বা বৃত্তির সমাধানই সাধককে প্রাণস্বরূপে বা নারায়ণে সাযুজ্যতা এনে দেয়। প্রাণসাধনা বা নাদসাধনার রহস্যটি এখানেই।

চৈতন্যের ছড়িয়ে দেওয়াই প্রাণ, প্রাণের গুটিয়ে নেওয়াই চৈতন্য। ''ছড়ালেই জগৎ, গুটিয়ে নিলেই ঈশ্বর'' : প্রাজ্ঞ আচার্যরা এই ভাষাতেই বলেছেন, ঈশ্বর এবং সৃষ্টিকে। সেই পরিভাষাকে অনুসরণ করে ভাষ্যকার 'প্রাণদঃ'-এর অর্থ করেছেন ক্ষেত্রজ্ঞ (ক্ষেত্র=দেহ)। আচার্য লিখেছেন, ''প্রাণিতি ইতি প্রাণঃ, ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা।'' যিনি প্রাণন করান অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ান তিনিই প্রাণ—প্রাণস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা। বৃহদারণ্যক শ্রুতি যেমন বলেছেন, 'প্রাণস্য প্রাণম্' (৪।৪।১৮)—মুখ্যপ্রাণ।

প্রাণের প্রসঙ্গে এসেই বুঝি পিতামহের মন চলে গেছে ছান্দোগ্য উপনিষদে, তাই সেই ভাষাতেই নারায়ণকে ডেকেছেন 'জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ' বলে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১।১) প্রাণকে বলা হয়েছে জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ। ''যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি, প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ''—যিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকে জানেন তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠই হয়ে যান। প্রাণই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ।

পাণিনি ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে অতিশয় বৃদ্ধকে বা বয়স্কতমকে জ্যেষ্ঠ বলা হয়—'জ্য চ' (পাণিনিসূত্র ৫।৩।৬১) সূত্রের প্রকরণে 'বৃদ্ধস্য চ' (পাঃ ৫।৩।৬২) সূত্রের অনুসারে বৃদ্ধ শব্দের স্থলে 'জ্য' আদেশ হয়, বা জ্য-এর ব্যবহার হয়।

যিনি সর্বত্র প্রশংসনীয় তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। পাণিনিসূত্র 'প্রশস্যস্য শ্রঃ' (৫।৩।৬০)-এর অনুসারে 'শ্রঃ' পদের আদেশের বিধান আছে।

ব্রহ্মসূত্রে পাই 'শ্রেষ্ঠশ্চ' (২।৪।৮) অধিকরণে আদিকারণরূপে পরমাত্মাকে জ্যেষ্ঠ বলা হয়েছে এবং বিশালতার দিক থেকে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

ছান্দোগ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে রৈক্কমুনি এবং জানশ্রুতি রাজার কথা আছে। ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কমুনি প্রাণের উপাসনার মাধ্যমে জানশ্রুতিকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করছেন। আধিদৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'বায়ুতত্ত্ব' বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'প্রাণতত্ত্ব' উপাস্যরূপে পূজনীয়। প্রকৃতিতে (অধিদৈবরূপে) অগ্নি সূর্য চন্দ্রমা জল ইত্যাদিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে 'বায়ু', তেমনই দেহের অভ্যন্তরে (অধ্যাত্মরূপে) বাক, চক্ষু, কর্ণ, মন আদি ইন্দ্রিয়বর্গকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে 'প্রাণ'—ত্রিভুবনের রক্ষক নারায়ণই এই প্রাণেশ, তাই তিনি প্রজাপতি।

প্রজাপতির পরবর্তী সম্বোধন 'হিরণ্যগর্ভ'। এই দুটি সম্বোধনের একটি সম্পর্কসূত্র পাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের একটি মন্ত্রে। ওই মন্ত্রে (৪।২) পরব্রহ্মকে বহু-র দৃষ্টিতে সম্বোধন করা হয়েছে এইভাবে, 'তৎ এব অগ্নি, তৎ আদিত্য, তৎ বায়ু, তৎ উ চন্দ্রমাঃ।/ তৎ এব শুক্রম্ তৎ ব্রহ্ম তৎ আপঃ তৎ প্রজাপতিঃ॥ তিনিই অগ্নি, সূর্য, বায়ুরূপে যেমন সমষ্টি-স্থূলশরীর (প্রজাপতি) তেমনি তিনিই সমষ্টি-সূক্ষ্মশরীর বা হিরণ্যগর্ভ।

আচার্য শংকর তাঁর গীতাভাষ্যের প্রথমেই নারায়ণকে সম্বোধন করেছেন 'পর অব্যক্ত' বা অব্যক্তের অতীত তত্ত্বরূপে—''নারায়ণো পরোঽব্যক্তাৎ অন্তমব্যক্তসম্ভবম্।'' ভাষ্যকার বলছেন এই ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত থেকেই উৎপন্ন। টীকাকার আনন্দগিরি ওই 'অণ্ড'-কে অপঞ্চীকৃত মহাভূত বা হিরণ্যগর্ভ বলেছেন : ''অপঞ্চীকৃত-পঞ্চমহাভূতাত্মকং হিরণ্যগর্ভতত্ত্বম্ অণ্ডম্ ইত্যাভিলভ্যতে।''

গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওই হিরণ্যগর্ভকেই বলেছেন অধিদৈব। ভাষ্যকার অর্থ করেছেন, আদিত্যমণ্ডলবর্তী সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হিরণ্যগর্ভ সেই পুরুষ-ই অধিদৈবত—''আদিত্যান্তর্গতঃ হিরণ্যগর্ভঃ সর্বপ্রাণি-করণানাম্ অনুগ্রাহকঃ।''

ব্রহ্মাণ্ডরূপ হিরণ্ময় অণ্ডের প্রতিভূ সৃষ্টির প্রথম শরীরী পুরুষই হিরণ্যগর্ভঃ, প্রজাপতি। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে (১০।১২১।১) পাই—''হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে''—সর্বপ্রথমে কেবলমাত্র প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রেই সর্বভূতের অধীশ্বর হলেন। সেই বিরিঞ্চি বা ব্রহ্মাজীর প্রত্যক্ষস্রষ্টারূপে নারায়ণকে সম্বোধন করা হয়েছে হিরণ্যগর্ভরূপে।

অধিদৈবরূপে নারায়ণকে হিরণ্যগর্ভ নামে সম্বোধন করেই অধিভূতরূপে তাঁকে ডাকা হল ভূগর্ভ নামে—'অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ' (গীতা ৮।৪)। সৃষ্টির সমস্ত নশ্বর ভাব বা ক্ষয়শীল বস্তুবর্গ (স্থাবর বা অস্থাবর)-কে অধিকার করে আছেন বলে তিনি 'অধিভূত'। ভাষ্যকার বলেছেন, সমস্ত ভূতবর্গকে গর্ভে ধারণ করে আছেন বলে নারায়ণের

ভূগর্ভ-বাচক সম্বোধন। শাস্ত্রীয় পরম্পরাকে মান্যতা দিয়ে পাশাপাশি অধিদৈব এবং অধিভূতরূপে নারায়ণকে ডাকলেন ভীষ্ম—হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ।

পরবর্তী সম্বোধন—মাধব। মা অর্থাৎ শ্রী, লক্ষ্মী। মা-র ধব বা পতি যিনি, তিনি লক্ষ্মীপতি মাধব। অথবা, মধুবিদ্যা দ্বারা যাঁকে জানা যায়, তিনি মাধব। জীবনকে অমৃতময় বা মধুময় করে তোলে যে-ব্রহ্মবিদ্যা, সেই ব্রহ্মবিদ্যাই মধুবিদ্যা। ছান্দোগ্য (৩।১১।৪) এবং বৃহদারণ্যকে মধুবিদ্যা প্রকরণে বলা হয়েছে হিরণ্যগর্ভ এই মধুজ্ঞান প্রজাপতি বিরাটকে বলেছেন। প্রজাপতি মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি প্রজা-পুত্র-শিষ্যাদিকে এই মধুবিদ্যা প্রদান করেছিলেন। ওই পরম্পরা ধরেই উদ্দালক ঋষি জ্যেষ্ঠপুত্র আরুণিকে বলছেন, ব্রহ্মবিদ্যার এইটিই ধারা।

ভাষ্যকার মহাভারত থেকে চয়ন করে এনেছেন আরও একটি শ্লোক যার অর্থ—"হে ভারত, মৌনতার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, যোগের দ্বারা মাধবকে সাক্ষাৎকার করো, নারায়ণকে উপলব্ধি করো।" অর্থাৎ মাধব সাধ্য, সাধন মৌনতা বা অন্তর্মুখীন বৃত্তি। অর্থাৎ মাধব প্রত্যগাত্মা।

মধু দৈত্যকে বধ করেছিলেন, তাই নারায়ণের একটি নাম মধুসূদন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পাই, মধু এবং কৈটভ শ্রীবিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উদ্‌গত দৈত্যযুগল। বহুবছর ধরে যুদ্ধ করে বিষ্ণু এদের নিধন করেন। ভাষ্যকার মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে (ভীষ্মপর্ব ৬৭।১৪-১৬) ওই পৌরাণিক তথ্যের প্রামাণিকতা দেখিয়েছেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বেশ কয়েকবার 'মধুসূদন' নামে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করেছেন অর্জুন। ওই সম্বোধনগুলিকে অনুধ্যান করলে দেখা যায়, যখনই স্বজনহত্যার বিষয়ে মানসিক চাঞ্চল্যের শিকার হয়েছেন তিনি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছেন, তখনই (১।৩৫, ২।৪, ৬।৩৩, ৮।২), ভগবানকে ডেকেছেন মধুসূদন নামে। ভাবটা যেন এই : হে কৃষ্ণ, তুমি তো দৈত্যের বিনাশকারী মহাবাহু। তুমি জগতের কল্যাণকারী। তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও আমার কল্যাণের পথ, আমার করণীয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে স্বজনের রুধিরে আরক্ত, শোকার্ত যুধিষ্ঠিরকে পিতামহ যেন বলতে চাইছেন, "হে যুধিষ্ঠির, তুমি মধুসূদনকে স্মরণ করো, আশ্রয় করো। তিনিই বোঝাবেন তোমার আশু কর্তব্যের পরিমার্গটিকে। মধুসূদনই ত্রাণকর্তা—ত্রাহি মধুসূদন! *(ক্রমশ)*


## উপনিষদের অমৃত

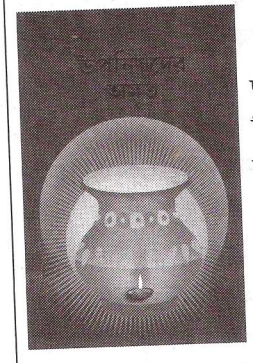

স্বামী বিবেকানন্দ বেদ-উপনিষদের শাশ্বত ভাবধারাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে। তাঁরই চিন্তাধারার অনুবর্তনে নিবোধত পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপনিষদীয় আলোচনার সূত্রপাত। 'উপনিষদের অমৃত' নামে দশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই মনোজ্ঞ উপনিষদচিন্তন বহুজনের অনুরোধে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিবোধত পত্রিকার শ্রদ্ধার্ঘ্য এই গ্রন্থটি শাস্ত্রামোদী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে। মূল্য ১৫০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ, সারদাপীঠ, অদ্বৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।